লেখাপড়ার বাইরে

হৃদয়ের আকাশে 'স্নেহনীড়'

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

ছবি: তমাল ভট্টাচার্য

সংস্থার শিক্ষার্থীরা

জীবন যেখানে থমকে দাঁড়ায়, হৃদয় সেখানে আকাশ— সে রকমই এক স্কুলের নাম 'স্নেহনীড়'। সমাজ যাদের ব্রাত্য করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, স্নেহনীড় তাদেরই দু'হাতে টেনে নিয়েছে।

উত্তরপাড়ার ২বি, কবি কৃষ্ণধন চ্যাটার্জি স্ট্রিটের একতলার তিন-চারটি ঘরে ২৫ জন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে 'স্নেহনীড়'। স্নেহনীড়ের নেপথ্যে রয়েছে তাদেরই মহিলা সংগঠন 'শতাব্দী'।

শতাব্দীর তেত্রিশ জন মহিলা সদস্য মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু- কিশোরদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তাকে কমিয়ে আনার কর্তব্যে ২০০৪ সালে এই স্কুল শুরু করেন।

এখানকার শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন সুলতা মণ্ডল, লক্ষ্মী চৌধুরি, জ্যোৎস্না বসু, প্রণতি মণ্ডল, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপ্লব মণ্ডলের মতো আন্তরিক মানুষেরা।

স্নেহনীড়ের শিক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য স্কুলের থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে নতুন ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছুদিন অবজারভেশনে রাখা হয়। তারপর ওদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝে জীবনে চলার পথে যে সমস্ত দিকের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন, তাদের সেগুলিই শেখানো হয়। এর মধ্যে স্বনির্ভরতা, অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় যেমন আছে, তেমনি মোমবাতি তৈরি, পাটের ব্যাগ, কাগজের গিফট্ প্যাক তৈরির মতো বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। এ ছাড়া নিজেদের নাম- ঠিকানা লেখা, টাকাপয়সা গোনা, ঘড়িতে সময় দেখা, যোগাসন, ছবি আঁকা, কার্ড তৈরি, রঙ চেনা ইত্যাদি শেখানো হয়। কিন্তু কোনও কিছু শেখানোর আগে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন তা হল, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন। ওরা যদি বোঝে আন্টিরা (শিক্ষিকা) ওদের ভালবাসছেন, তখনই ওরা সহযোগিতা করে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বছরে একবার স্পোর্টসও হয়। স্পোর্টসের ইভেন্টের মধ্যে রয়েছে রান, শটপুট আর ওয়াকিং। ছাত্রছাত্রীরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে স্পোর্টসে যোগ দেয়।

এ বছর মানসিক প্রতিবন্ধীদের 'আঞ্চলিক স্পেশাল অলিম্পিকে' স্নেহনীড়ের ৯ জন ছাত্রছাত্রী পুরস্কৃত হয়েছে।

পৌলমী, শিবনাথ, মৌমারা যোগাসনও করে। যোগাসন শিক্ষিকা রেখা নাথ ওদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা ফুড চার্ট ও আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। রেখার নির্দেশমতো স্কুলের অন্য শিক্ষিকারাও ছাত্রছাত্রীদের যোগাসন করান। সাইকোলজিস্ট মন্দিরা ব্যানার্জি সপ্তাহে একদিন করে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সেলিং করান। প্রয়োজনে তাদের বাবা-মাকেও কাউন্সেলিং করানো হয়।

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা, শিক্ষিকাদের বেতন, প্রতিদিন মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা— সব কিছুই 'শতাব্দী' বহন করে।

স্নেহনীড়ের এই কর্মপ্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরপাড়ার আর কে স্ট্রিটে পাঁচ কাঠা জমি দেওয়া হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান পিনাকী ধামালিও স্নেহনীড়কে নানাভাবে সহায়তা করেন।

স্নেহনীড়ের চিফ অ্যাডভাইসার সুপ্রিয় গুপ্ত, পেট্রন স্বনামধন্য লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আশুতোষ জয়সওয়াল, সুখেন্দু রায়চৌধুরিরা মনে করেন একদিন স্নেহনীড় আরও অনেক মানুষের আশ্রয় ও ভরসাস্থল হয়ে উঠবে।

স্নেহনীড়ের চেয়ারপার্সন শুক্লা হাজরা, সেক্রেটারি নূপুর বসু রায়, কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণা সিংহ বা শিক্ষিকা শিলালি বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিকভাবে চান, 'স্নেহনীড়' মানসিক প্রতিবন্ধীদের পথ দেখাক। স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথে আর সবার মতো একদিন তাদের জীবনটাও সুন্দর, সবুজ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে দুর্ভাবনায় দিন কাটাতে হবে না তাদের বাবা-মাদেরও। স্নেহনীড়ের নির্ভরতায় তারা শক্ত জমিতে পা রাখতে পারবেন।'

ইচ্ছা থাকলে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়। ভালবাসার দুটি হাত-ই পারে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার পাহাড়কে ঠেলে সরিয়ে দিতে। সে কথাটাই আর একবার প্রমাণ করে দিল 'স্নেহনীড়'।

ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো

শিক্ষিকাবৃন্দ

'আই লাভ মাই ইন্ডিয়া' গানটা শুনলে আমি না নেচে থাকতেই পারি না

পৌলমী রায়: আমার নাচতে খু-উ-ব ভাল লাগে। হিন্দি সিনেমার গান শুরু হলেই আমি নাচতে শুরু করি। বিশেষ করে 'আই লাভ মাই ইন্ডিয়া' গানের সঙ্গে। এই গানটা শুনলে আমি না নেচে থাকতেই পারি না। এর আগে আমি দু'জায়গায় নাচ করেছিলাম। পরে শিলালিদের কাছে শুনেছিলাম, তাঁর একটা ছিল অ্যান্ডারসন ক্লাব, আর একটা ছিল শিশির মঞ্চ। সেদিন অনেক লোক আমাদের নাচ দেখে হাততালি দিয়েছিল। আমি কিন্তু ছবিও আঁকি। পেন্সিলের চেয়ে স্কেচ পেন দিয়ে আঁকতেই আমার বেশি ভাল লাগে। আবার প্যাস্টেল দিয়েও আঁকি। তবে সিনারি ছাড়া অন্য কিছু আঁকতে ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে খেলাধুলোও করি। স্কুলের স্পোর্টসের দৌড়ে আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে লুডো খেলি। লুডো খেলতে কেন ভাল লাগে জানো? লুডোর ওই লাল, নীল ঘুঁটি আর ছক্কাটাই তো সবচেয়ে মজার।

আঞ্চলিক স্পেশাল অলিম্পিকের শটপুট ও ডিসকাসে আমি প্রথম হয়েছিলাম

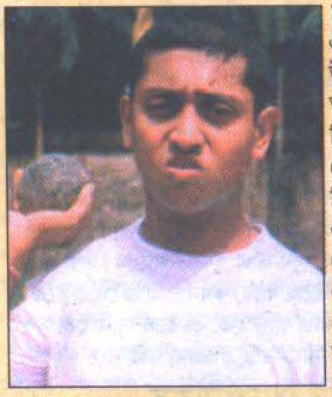

সুমিত সিংহরায়: যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আমি ব্যাটিং ভাল করি না বোলিং? উত্তরে বলব, আমি দুটোই ভাল করি। অর্থাৎ আমি হলাম একজন অলরাউন্ডার। একবার পাড়ার ক্লাবের হয়ে নদীরডাঙা ক্লাবের বিরুদ্ধে ১২৫ রান করেছিলাম। আর একটা ম্যাচে বল করা পাঁচটা উইকেটও পেয়েছিলাম। তারপর থেকে কি হল কে জানে ক্রিকেটটাই ছেড়ে দিলাম। তখন কোনও কিছুই ভাল লাগত না, ক্রিকেট, ফুটবল কিছুই না। এখন অবশ্য টিভিতে ক্রিকেট দেখি। আমি সৌরভের ভক্ত। একজন বাঙালি হিসেবে সৌরভের জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে আমি শটপুট আর ওয়াকিং ইভেন্টে নাম দিই। ২০০২ সালের স্পেশাল অলিম্পিকে (আঞ্চলিক) শটপুট এবং ওয়াকিংয়ে আমি প্রথম হয়েছিলাম। এবার ফুটবলের কথায় আসি। ক্রিকেটের মতো ফুটবল দেখতেও বেশ ভাল লাগে। এর আগে কাকার সঙ্গে সল্টলেক স্টেডিয়ামে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবল খেলাও দেখেছি। মোহনবাগান আমার প্রিয় দল। আর সবচেয়ে ভাল লাগে বাইচুং আর ব্যারেটোর খেলা। ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর কোচ হিসেবে কার্লোসকেও এখন বেশ ভাল লাগছে।

আন্টি-আন্টি খেলতে আমার খুব ভাল লাগে

শিখা খাটোর: আমার বন্ধুরা খুব ভাল। আমরা একসঙ্গে খেলি, টিফিন খাই, নাচ-গান করি। আবার কখনও মজা করে অন্য বন্ধুদের রবার, পেন্সিলও লুকিয়ে রাখি। পরে অবশ্য দিয়ে দিই। এই মজাটা ছাড়া আর একটা মজাও করি, সেটা হল 'আন্টি আন্টি' খেলা। আমি তখন আন্টি সেজে আমার বন্ধুদের পড়াই, নাচ-গান শেখাই, যোগাসন করাই আবার বকাবকিও করি। এই খেলাটা আমার বন্ধুদের খুবই প্রিয়। তাই এই খেলাটাই আমরা বেশি খেলি। আবার ইচ্ছে হলে নাচও করি। কেউ শেখাতে এলে আমার কিন্তু নাচতে ইচ্ছা করে না, রাগ হয়। নিজে নিজে নাচতেই ভাল লাগে। আর ভাল লাগে মাঠে দৌড়োদৌড়ি করতে। আমি যখন দৌড়ই আমার বন্ধুরা আমাকে ধরতেই পারে না। তখন আমার খুব মজা লাগে। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে স্কুল ড্রেস পরতে। আচ্ছা বল তো, আমার তো কত সুন্দর সুন্দর স্কার্ট, ঘাঘরা আর সালোয়ার কামিজ আছে। এগুলো ছেড়ে কেউ স্কুল ড্রেস পরে?

এখন পর্যন্ত আমি শুধু বজ্রাসন, পদ্মাসন আর বৃক্ষাসনই শিখেছি

সুপর্ণা চৌধুরি: খেলাধুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে যোগাসন করতে। রেখা আন্টি আমাদের যোগাসন শেখান। এখন আমি শুধু বজ্রাসন, পদ্মাসন আর বৃক্ষাসনই শিখেছি। অন্য আসনগুলো এখনও বাড়িতে থাকলে 'সঙ্গীত বাংলা' চ্যানেলের গান শুনি। অন্য কোনও প্রোগ্রাম আমার ভাল লাগে না। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে, যখন আমার দিদি অন্য চ্যানেল ঘুরিয়ে দেয়। তখন আমার মাথা খুব গরম হয়ে যায়। আচ্ছা তোমরাই বল, জোজো, নচিকেতা আর শ্রেয়ার গান ছেড়ে অন্য কিছু দেখতে ভাল লাগে? স্কুলের আন্টিরা আমার কষ্টের কথা আর পছন্দ-অপছন্দের কথা খুব ভাল বুঝতে পারেন। তাই তো আমার সব সময় স্কুলে থাকতে ইচ্ছে করে, কখনও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না। ইস্, যদি স্কুলটাই আমার বাড়ি হত, তা হলে আমি তো সব সময়েই আন্টি আর বন্ধুদের আমার কাছে পেতাম, তাই না?

অবকাশ বৃদ্ধাশ্রমের প্রদর্শনীতে আমার তৈরি মোমবাতিও ছিল

শিবনাথ পাল: একদিন শিলালি আন্টিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বনির্ভর মানে কী? আন্টি বলেছিল, স্বনির্ভর মানে হল অন্যের থেকে কোনও সাহায্য না নিয়ে নিজের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করা। কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এখন আমি স্বনির্ভর হওয়ার

জন্য নানা রকমের জিনিস তৈরি শিখছি। আন্টিরা আমাকে মোমবাতি তৈরি করা, রাখি বানানো, পাট কিংবা কাগজ দিয়ে ব্যাগ তৈরি করতে শিখিয়েছেন। আমি এখন এগুলো খুবই ভালভাবে তৈরি করতে পারি। গত বছর 'অবকাশ' বৃদ্ধাশ্রমে আমাদের হাতের তৈরি জিনিসপত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে আমার তৈরি রঙিন মোমবাতিও ছিল। শরীরের জন্য আমি দৌড়োদৌড়ির খেলাধুলো করতে না পারলেও যোগাসন করি। শিলালি আন্টি বলেছেন যোগাসন করলে আমি নাকি সব কাজে আরও এনার্জি পাব। আমার বেড়াতেও খুব ভাল লাগে। আন্টিরা আমাদের প্রতি বছর বেড়াতে নিয়ে যায়। আন্টিদের সঙ্গে নিকো পার্ক আর সায়েন্স সিটিতেও বেড়িয়ে এসেছি। গত বছর আমরা বজবজে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। ওখানে সারাদিন হইহই করে নাচ-গান আর খাওয়াদাওয়া করেছিলাম। খুব আনন্দ হয়েছিল।

'স্নেহনীড়' আমার স্বপ্ন পূরণ করেছে

শিলালি ব্যানার্জি *(শিক্ষিকা)* : আমার জীবনের অনেকটাই কেটেছে আসানসোলে। সেখানে এমন কিছু ছেলেমেয়েকে দেখেছিলাম, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণের চেয়ে অনেকটাই কম। ওদেরকে নিয়ে আমার মনে অনেক প্রশ্নই উঁকি মারত। বিশেষ করে মনে হত ওদের জন্য নিশ্চয়ই আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর আমরা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসি। এর কয়েক বছর পর 'অলকেন্দু বোধ নিকেতন' থেকে ডিপ্লোমা ইন স্পেশাল এডুকেশন অন মেন্টাল রিটার্ডেশন-এর কোর্স করি। এ ছাড়া মন্টেসারি ট্রেনিংও নিয়েছি। বর্তমানে স্পেশাল এডুকেশনের ওপর বি এড করছি। আসলে মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আমার বহুদিন ধরেই ছিল। আজ আমার সে ইচ্ছার অনেকটাই পূরণ হয়েছে 'স্নেহনীড়ের' জন্য।

স্নেহনীড়ের পরিচালন সমিতির (শতাব্দী) দিদিরাও আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। ফলে, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করতে পারছি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যাতে মানসিক ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা ওদের যাবতীয় ট্রেনিং করাই। যেমন নিজের নাম-ঠিকানা লিখতে পারা, টাকাপয়সার হিসেব রাখা, চট অথবা কাগজের ব্যাগ তৈরি করা ইত্যাদি। তবে হাতের কাজের ট্রেনিং দেওয়া হয় আঠারো বছরের বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের। এ সবের পাশাপাশি আমরা ওদের নাচ, গান, আবৃত্তি আর যোগাসন শেখাই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, ওদের ভালবাসার অনুভূতি আছে। ভালবেসে ওদের কিছু শেখাতে চেষ্টা করলে ওরা খুব সহজেই সেটা গ্রহণ করে।

মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা যেদিন সমাজের মূলস্রোতে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে, সেদিন আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে।